**শেফালীর কান্না**

সামনে প্লেটে গরম ধোঁয়া ওরা ভাত আর কলমি শাকের সাথে দুয়েকটি পুটি মাছের ঝোল। মিজান মিয়া ভীষণ ক্ষুধার্ত বোঝাই যাচ্ছে । পাটি বিছিয়ে সুন্দর করে প্লেট গ্লাস সাজিয়ে দিয়েছে শেফালী। এখন শুধু ডাল এনে দিলেই হলো। মিজান মিয়া ও শেফালীর ছেলে বাবুল তার মায়ের শাড়ী আচঁল ধরে হাঁটছে। গায়ে একটা ময়লা গেন্জি, নাক দিয়ে অনবরত পাতলা সর্দি বের হয়ে গরিয়ে নামছে। সে কি একটা নিয়ে জেদ করে কাদঁছে। একটু পরেই বোঝা গেল সে মায়ের কোলে চড়তে যাচ্ছে। মিজানের কাছে ছেলের এই মিহি সুরের এই কান্না অসহ্য মনে হচ্ছে। শেফালী বিষয়টা লক্ষ্য করে বাবুলকে কোলে নিয়েই বাইরের চূলা থেকে গরম ডালের পাতিল আনতে গেল। এক হাতে ডালের পাতিল আর কোলে বাবুল । এই ভঙ্গীতে তাকে নুয়ে পরা একটা বাঁশের কঞ্চির মত লাগে দেখতে। খরির চূলায় রান্না এবং ঘরে বাইরে আসা যাওয়ায় শেফালীর ক্ষীণ দেহ যেন আর চলছিল না। সকাল থেকে একমুঠো মুড়ি ছাড়া কিছুই পেটে পরেনি। শ্বাশুরী সাহেরা বেগম তীক্ষন দৃষ্টিতে শেফালীকে পযবেক্ষণ করছিলেন। তিনি এবার মুখ খুললেন। মুখের মধ্যে পানের পিক গুলো গিলে চোখে তীব্র আক্রোশ নিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে বললেন

: বেইন্যাকাল থাইক্যা দেখতে আছি পোলাডা লইয়া খালি আল্লাদীপনা। স্বামীর ভাতটা ঠিকমত রাইন্ধা আনতে এত সময় লাগে বান্দীর ছেড়ির। দাউর গুলা তো আমি ই টোহাইয়া আনলাম। উঢানে বইয়া চুলায় পাতিল দিয়া ভাত আর এড্ডু সালুন রানবে হ্যাতে এত সময় লাগে ক্যা? চৈত্রের খরতাপে মাথার উপর কোন চাল না থাকায় রান্না করতে গিয়ে আমেনার শরীর ঘেমে একাকার, শুকনো মুখে ফরসা গালে ঘামের ফোটা ঝরছিল। কালো চুল ভিজে গেছে ঘামে। শেফালী তার শ্বাশুরীর কথায় কোন জবাব দিল না। এই মহিলাকে সে ভালই চেনে। ছেলের কাছে মিথ্যা কথা বলে বলে অনেক মার খাওয়াতে পারেন সাহেরা বেগম। ইতোমধ্যে মিজান ভাত খাওয়া শুরু করেছে। কিন্তু বাবুল হঠাৎ করেই তারস্বরে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। শেফালী বাবুলকে কোলে নিয়ে একটু দুরে দাড়িয়ে তাকে থামানোর চেষ্টা করতে থাকে। মিজান দুই লোকমা দেয়ার পরেই ভাতের মধ্যে কি যেন একটা খুঁজে পায় । হ্যা এইতো একটা চুল ভাতের সাথে জড়িয়ে আছে। সাহেরা বেগমও খেয়াল করছেন বিষয়টা। সাহেরা বেগম খেকিয়ে উঠলেন: অলক্ষী কোম্মের? ভাতে চুল পরে কেমনে? স্বামীর খাওয়ার দিকে মনোযোগ থাহে না হারাদিন কেবল ঢং ঢাং। মিজান ক্ষিপ্ত হয়ে লাল চোখে তাকাল শেফালীর দিকে। ককর্শ কন্ঠে চিৎকার করে উঠলো :এ মাগী তোর হারাদিন কামডা কি? ভাতে চুল পরলো কেমনে হারামজাদি। সে ভাতের প্লেটটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। শেফালীর মুখটা ভয়ে মরা মানুষের মত সাদা হয়ে গেল। তার হৃদস্পন্দর যেন বা থেমে যাবে। ছেলেটা হঠাত করে বাবার রক্ত চক্ষুর ভাষা যেন বুঝে গেল। সে চুপ হয়ে মায়ের বুকে মাথা লুকালো। মিজান এসে শেফালীর চুলের মুঠি ধরলো। তোর চুল আইজ বেবাক টাইন্যা ছিড়্যা ফালামু হেরপর দেখমু ভাতে চুল আয় কোম্মেদিয়া? হারামজাদি , কুত্তার বাচ্চা কিল চড় পড়তে লাগলো শেফালীর ক্ষীনকায় শরীরে। যে শরীরটা মার খাওয়ার কোন জায়গাই নেই। শেফালীর কোল থেকে বাচ্চাটা ফেলে দিয়ে পশুর মত উন্মত্ত হয়ে উঠলো মিজান। যেন আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে। এতবড় অপরাধ কোনভাবে ই বরদাশত করা যাবে না। না কোনভাবেই না। ২২ বছরের শেফালীর কান্নায় ভরে উঠলো বারান্দার ছোট জায়গাটা। সে মিজানের পায়ে ধরে বলল আর মাইরেন না। আর হইবে না । আমারে মাফ কইরা দেন। সাহারা বেগম বেশ আয়েশ করে দেখছেন বিষয়টা। খোশ মেজাজে বললেন : কোন কাজ নাই, হুদা এড্ডু রান্ধন বাড়ন হেডাও ঠিকমত করে না। এমন অকম্মা বউ থাকলে এরহমই হবে। এহন বোঝ মজা। না. মিজান থামে নাই শেফালীর আর্তনাদে। মারতেই রইল। শেফালী নাক ফেটে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটির ঘরে। শেফালী করুন চোখে চেয়ে আছে তার স্বামীর দিকে। অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে শেফালী ভাবলো এই নিষ্ঠুর লোকটা কেন তার স্বামী হল? এত বড় দুনিয়ার কোথাও কি তার জন্য একটু জায়গা নেই?

**মায়ার মমতা**

মায়া তার অসুস্থ মায়ের মুখের দিকে করুন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার শ্বাসটা বেড়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে। পেটের মধ্যে ঘা হয়েছে বলেছেন ডাক্তার। কেন ঘা, কিসের ঘা তা কিছুই বলেননি। শুধু বললেন বাড়ী নিয়ে যান। বাড়ীতে ভাল মন্দ খাওয়ান। মায়া বুঝলো মা আর এ দুনিয়াতে বেশী দিন নেই। তার বুক ফেটে কান্না এল। মা –ই এ দুনিয়ায় তার একমাত্র ভরসা। ভালবাসার একমাত্র ঠিকানা। মায়ার চোখ থেকে তপ্ত অশ্রু ঝরতে থাকে। মাকে সে অশ্রু দেখতে দেয় না সে। ঝুপড়ি ঘরের চালে বৃষ্টি পরছে। বৃষ্টির পানি আর চোখের পানি একাকার হয়ে মিশে যায়। একটি বাটিতে সামান্য একটু গরম ডালের পানি খাওয়ানোর চেষ্টা করে মাকে। তার ভাই গেছে কাজে । ভাবী মার তেমন কোন সেবাযত্ন করে না। বরং বোঝাই মনে করেন। স্বল্প আয়ের সংসারে যেন বিরাট দায়।

শ্বশুরবাড়ী থেকে ৩ দিনের সময় নিয়ে এসেছে মায়া । বলেছে মাকে দেখেই চলে আসবো। স্বামী বদরুল বলেছে: কতা যেন ঠিক থাহে। বাড়ী যাইয়া বেড়াইয়া দিন কাটাবা আমার আমার মায় রানবে, বাবায় সময়মত খাওন পাইবে না, পোলাপান দেকপে, হেইডা যেন না হয়। হেইলে বাড়ী আর ঢোকতে পারবা না কইয়া দেলাম। মায়ার সেই ৩ দিন আজ শেষ। সে বুকের ভিতর গভীর ব্যথা অনুভব করে। মা কে এভাবে ফেলে যেতে তার প্রাণ ফেটে যাবে। এই তিনদিন মায়ের পাশে থেকে তার শরীরে অসহ্য ব্যথার স্বাক্ষী হয়েছে সে। মা যেন মায়ার কোলেই মাথা রেখে মরতে চায়। কতবার অসহায় দৃষ্টি মেলে মায়ার দিকে শুধু চেয়ে থেকেছে। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো মায়ার হাতের মুঠিতে। বদরুল। একবার ভাবলো ফোন টা ধরবে না। আবার ভাবলো ফোনটা ধরে আরো দুদিনে সময় চেয়ে নেবে। মায়া ফোনটা ধরলো। : হ্যালো হয় শোনতে আছি কয়েন। বদরুল ও পাশ থেকে বেশ ককর্শ স্বরে বললো : বেড়াইন্যা হইছে তোমার। আইজ কিন্ত বাড়ীত আইবা সন্ধ্যার মধ্যে। মায়া অসহায়বোধ করলো তবু সাহস নিয়ে বললো শোনেন মায় খুব অসুস্থ বাঁচে মরে অবস্থা। আর দুইডা দিন থাইক্যা আই। আমার মনটা মায়রে ছাইড়্যা এহন যাইতে চায় আর মাত্র দুইডা দিন। বদরুল ও পাশ থেকে চরম রাগান্ব্তি স্বরে বললো তোমার এই ন্যাকামী বন্দ কর। আইজ সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ীত দেকতে চাই নাইলে বেড়ানোর মজা বুজাইয়া দিমু কইলাম। তোমার বেকম্মা ভাইডা আছে না? মায়েরে হেইতো দেকতে পারে। সন্ধ্যায় চইল্যা আও। মায়াকে আর কোন কথার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা কেটে দেয় বদরুল। মায়া তাকিয়ে দেখে মা তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ক্ষীনস্বরে বলে উঠলো মাগো আর দুদিন থাইক্যা যাও। মায়া বললো আচ্ছা মাগো।

মায়া বদরুলের বেঁধে দেয়া সময়মত নিজবাড়ী ফিরতে পারলো না। অতিরিক্ত দুদিন সে অসুস্থ মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েই পার করে দিল। তা ও মা আসতে দিতে চাননি। বলেছিলেন আর দেহা হইবে নারে মায়া। মায়া বললো আমি আবার আইয়া পরমু মা । তুমি একটু ধৈয্য ধর। আল্লাহ তোমারে সুস্থ কইরা দেবে মা। কিন্তু দুজনেই যেন দুজনের বুকের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পারছিল। স্বামী বদরুল সন্ধ্যায় ঘরের কোনায় বসে মায়ের সাথে কথা বলছিল। মায়াকে দেখেই খেকিয়ে উঠলো। তোরে এতদিন থাহার পারমিশণ কেডা দেছে ? তোর এত সাহস? বইতে দিলে শুইতে চায়। মায়া বললো মায় খুব অসুস্থ । আরো দুদিন থাকতে পারলে ভাল হইতো। বদরুল মায়ার উত্তরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। আবার কতা কয় বেয়াদপ? মায়া যেন আর নিজেকে সামলাতে পারলো না সে বললো এত চেতেন ক্যা? বদরুল মায়ার এই প্রতিউত্তর আর মুখে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। ক্ষ্যাপা কুকুরের মত দাঁত বের করে হিংস্রভাবে ঝাপিয়ে পরলো মায়ার ক্লান্ত শরীরে উপরে। চুলের মুঠি ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ছিটকিনি বন্ধ করার আওয়াজ ঢেকে গেলো মায়ার আর্তচিৎকারে।

**অসহায় রুমা**

রুমা দাড়িয়ে রইল বাস ধরার জন্য। মাথার উপর সূযটা যেন আগুন ঢেলে দিচ্ছে। হাতের টিফিন ক্যারিয়ারটা যেন ওর ক্ষুধার্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সকাল থেকে তেমন কিছূই খায়নি রুমা। অথচ তার হাতের ব্যাগে রয়েছে চারটি টিফিন ক্যারিয়ার। প্রতিটি টিফিন ক্যারিয়ার বাটিতে রয়েছে তার নিজের হাতে রান্না করা সুস্বাদু টাটকা সবজি, মাছ, মুরগীর মাংস আর ডাল চচ্চরী। সেই সকাল থেকে সে রান্না করেছে এক হাতে। রান্নার পরে মনে হয়েছে শুয়ে থাকে কিছুটা সময়, কিন্তু সময় তো থাকে না হাতে বিশ্রাম নেবার। অফিস পাড়ায় মতিঝিলে ছুটছে সে এই খাবার নিয়ে। অফিসের সাহেবরা মিলে তাকে দুপুরের রান্নার জন্য ঠিক করে নিয়েছে। বাজার করা থেকে শুরু করে সবই রুমা করে। বাজারের ভাল সবজি মাছ মাংস কিনে বাসায় রান্না করে তা পৌছে দিতে হয় স্যারদের অফিস কক্ষে। নিজেই অফিসের পিয়নকে বলে এই কাজটা ম্যানেজ করে নিয়েছে। তার রান্নার হাত ভালো। স্যারেরা তার খাবার খেয়ে সন্তষ্ট। তাই রুমা কষ্ট করলেও লাভ যেটা পায় তাতে সে নিজে চলতে পারে আর মেয়েকে পড়ার খরচ দিতে পারে। রুমা পরিশ্রমী মেয়ে। সে সবসময় নিজে কিছু করে এই স্বার্থপর পৃথিবীতে টিকে থাকতে চায়। বিয়ের একবছরের মধ্যে তাকে আর ভালো লাগেনি স্বামীর । কথায় কথায় মারধর,গালিগালাজ। রুমা খুঁজেই পায় না এই আচরণের কারণ। এর মধ্যেই পেটে আসে পরী। পরী জন্মাবার আগেই স্বামী কাশেম তাকে ফেলে চলে যায় নিরুদ্দেশে। আজ ১৫ বছর কোন খবর নেই। মেয়েকে নিয়ে কঠিন জীবন সংগ্রামে নেমেছে সে। বাস থেকে নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে অফিসের কাছে চলে আসে রুমা। তার গায়ের কামিজ ঘামে ভিজে গেছে। গেটের দারোয়ান তাকে চেনে। সে গেট খুলে দেয় এবং চোখের কোণায় একটা বিশ্রী রকমের হাসি দেয়। তার দুটো চোখ রুমার শরীরে আটকে থাকে। যেন চোখ দিয়ে তার সব কামনা মিটিয়ে নেবে। ইদানিং দারোয়ানটা অনেক বেশী বেহায়াপনা করছে। দেখলেই চোখ টিপে বিশেষ একটা ভঙ্গি নিয়ে দাড়িয়ে থাকে। : কিগো বইন ঘামাইয়া দেহি নাইয়া ফালাইছ, তয় এরকম দেখতে কিন্তু তোমারে খুব মিষ্টি লাগে। আবার একটা চোখ টিপ দেয়। রুমা কিছু না বলে গেট থেকে তাকে সরতে বলে। কারন এই ব্যাটাকে ক্ষ্যাপালে অনেক ক্ষতি সে করতে পারে। কিন্তু দিন দিন শুয়োরের বাচ্চা কথাবার্তার লাগাম ছেড়ে দিয়েছে। মনে মনে গালি দেয় রুমা। জয়নাল দারোয়ান। অত্যন্ত প্রিয় পাত্র স্যারদের।আজ তিনমাস ধরে এখানে কাজ নিয়েছে রুমা। একটু একা পেলেই পিয়ন দারোয়ান টাইপের লোকগুলি বিভিন্ন ধরণের টিপ্পণী কাটে। কিগো একলা একলা থাক কেমনে ? আমাগো পছন্দ হয় না? মাজে সাজে একটু ফূর্তি করবা নি? আজ বাসেও এক খাটাস লুইচ্ছ্যা তাকে ফাঁক বুঝে বুকে চাপ দিয়েছে। এত লোকের মধ্যে কি করবে রুমা। দুইহাতই আটকা।চাপ দিয়ে সুন্দরমত পাশ কাটিয়ে বাস থেকে নেমে গেল। ইচ্ছা করছিল হারামজাদার পাছায় একটা লাথি মারতে। আক্রোশে ঘৃণায় বমি করতে ইচ্ছা করছিল রুমার। আজ স্যারদের মিটিং ছিল। সময়মত দুপুরের খাবার খেতে পারেন নি।তাই বিকেলের দিকে লাঞ্চ সেরেছেন স্যাররা। স্যারদের কাছ থেকে প্রতিদিন তাকে পরের দিনের মেন্যু শুনে নিতে হয়। আজ সন্ধ্যা হয়ে গেল। একে একে সবাই বাসার পথে বের হয়ে গেছে। রুমা যখন গেটের কাছে আসলো তখন দারোয়ান গেটে নেই। রুমা চারিদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। নাহ কোথাও নেই। সে আবার অফিসের কমন রুমে গেল। না কেউ নেই কোথাও। অফিসের ছাদের একটা রুমে দারোয়ান থাকে। রুমা ছাদে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও থেমে গেল। হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। কে যেন তাকে জাপটে ধরেছে। ফিস ফিস শব্দ করে একটা পুরুষ কন্ঠ: একদম কোন কথা না। দারোয়ানের কন্ঠ। চুপচাপ কাম সাইরা ফালামু চিল্লাচিল্লি করলে তোমারই ক্ষতি। খালি রুপ দেখাবা কাম দেবা না এডা আমরা মানমু না। রুমা আতংক নিয়ে তাকায় চারিদিক । না কোন উপায় নেই। সে দুপা পিছনে দিয়ে বলে ভালা হইবো না কিন্তু আমি তোরে খুন কইরা ফালামু। দারোয়ান কুৎসিত ভঙ্গীতে হাসে। ডাক না তোমার বান্ধবদের। কেউ আইবো না, তয় আমার বন্ধুদের ভাগ না দিয়া এমন মাল খামু না ! কমন রুমের মেঝেতেই রুমাকে ধাক্কা দিয়ে শুইয়ে দিল সে। নাহ্ দারোয়ান এক নয়। টিপ্পনী কাটা আরো দুজন তার সঙ্গী আসছে ধীর পায়ে কুকুরের মত। এতদিনের লোভী পশুগুলি রুমাকে কামড়ে খেতে লাগলো সন্ধ্যার আঁধারে। কাছেই মাইকে আজান শুরু হলো।